আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং তাদের কথা

‘কারা মুক্তিযোদ্ধা’ কথা প্রসংগে এই নিয়ে আলোচনা জমে উঠল। টরন্টো পিছনে ফেলে এসেছি প্রায় ঘন্টা খানেক হলো। দুইজন মুক্তিযোদ্ধার সাথে অটোয়া যাচ্ছি, একজন ‘একাত্তুরের গেরিলা’ গ্রন্থের লেখক, প্রখ্যাত কৃষিবিজ্ঞানী জহিরুল ইসলাম, অন্যজন টরন্টোর বাংলাকাগজ পত্রিকার সম্পাদক জাহাঙ্গীর ভাই।

স্বাধীনতা/বিজয়ের চল্লিশ বছরপূর্তি উপলক্ষে ডিসেম্বরে টরন্টো’তে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে উত্তর আমেরিকায় মুক্তিযোদ্ধাদের পূনর্মিলনী। তারই প্রস্তুতি হিসাবে জহির ভাই আর জাহাঙ্গীর ভাই’যাচ্ছেন অটোয়া, আর আমিও তাদের সাথে যাচ্ছি। গাড়িতে জহির ভাই আর জাহাঙ্গীর ভাই’এর কাছ থেকে শুনছিলাম তাদের একাত্তুরের অভিজ্ঞতা। আমিও আমার প্রতক্ষ্য অভিজ্জতা’র আলোকে দেখা কিছু ঘটনা ও ব্যাক্তির কথা এই প্রসঙ্গে তুলে ধরলাম। ‘কারা মুক্তিযোদ্ধা’ সেই প্রসঙ্গে পরে আসছি।

১৯৬৯ সাল, আমি ইউ ল্যাব’এ ক্লাস থ্রি তে পড়ি। সায়েন্স ল্যাবরেটরী থেকে নিউ এলিফেন্ট রোড ধরে, পুরানো রেললাইন পাড় হয়ে, কাঁটাবনের মধ্য দিয়ে জিন্নাহ হলের (র্বতমানে সূরযসেন হল) পিছনের দেয়াল টপকে,স্কুলে যাতায়ত করা ছিল আমাদের র্শটকাট রাস্তা। মাঝে মধ্যে কাঁটবনের মধ্যে অবস্থিত ‘ঘোড়াঘর’এ অবস্থিত ঘোড়া দেখা এবং মহসীন হলে’র ‘লিফটে চড়া ছিল, আমাদের জন্য বাড়তি আর্কষন। অখন ঢাকা শহরে অল্প কিছু লিফট ছিল।

এমনি সময়ে একদিন দেখি, কাঁটবনের মোড়ে আর্মির ট্রাক, উপরে মেশিনগান ফিট করা। একজন বড় ভাই বললেন, এটা আর্মি না, ই, পি, আর এবং উপরে এল, এম, জি ফিট করা। ই, পি, আর বলল, আজ স্কুলে যাওয়া যাবে না, বাড়ি চলে যাও। এলিফেন্ট রোডের সিগন্যাল বাতি’র কাছে (র্বতমানে বাটা সিগন্যাল নামে পরিচিত) আসার পথেই শুনলাম, সার্জেন্ট জহুরুল হক’কে মেরে ফেলা হয়েছে আর লোকজন বলাবলি করছে সার্জেন্ট জহুরুল হক’এর বাসা সামনেই, এলিফেন্ট রোডে। আমরাও বইয়ের ব্যাগ হাতে নিয়ে তাদের পিছু পিছু সার্জেন্ট জহুরুল হক’এর বাসার দিকে রওয়ানা দিলাম। পরর্বতীতে এলিফেন্ট রোড’কে সার্জেন্ট জহুরুল হক সড়ক নাম করন করা হয়, কিন্তু কালের আর্বতে তা হারিয়ে গেলেও, তদানীন্তন ‘ইকবাল হল’, পরর্বতীতে ‘সার্জেন্ট জহুরুল হক হল’ নামে পরিচিতি লাভ করে এবং এই মহান শহীদের কথা আমাদের মনে করিয়ে দেয়।

আমরা বড়দের সাথে হাটতে হাটতে এলিফেন্ট রোড'এ 'নয়ন মার্কেট' (পরর্বতীতে 'মল্লিকা' সিনেমা হল) এর পাশে সার্জেন্ট জহুরুল হক'এর পৈতৃক বাড়ি 'চিত্রা'র সামনে গেলাম। গিয়ে দেখি প্রচন্ড ভীড়, বাসায় ঢুকার কোন সুযোগই নাই। তাই বাসায় ফিরে এলাম কিছুটা আক্ষেপ নিয়ে। এর ঠিক তিন বছর পর, স্বাধীনতার পরের বছর আমরা এলিফেন্ট রোড'এ মুভ করি আর সার্জেন্ট জহুরুল হক'এর ছোট ভাই ইমু ভাই'এর সাথে বেশ ভালভাবে পরিচিত হই। সার্জেন্ট জহুরুল হক'এর অন্য আরেক ভাই আমিনুল হক পরর্বতীতে বাংলাদেশের এর্টনী জেনারেল নিযুক্ত হন।

প্রায় সেই সময়ে আমাদের সায়েন্স ল্যাবরেটরী কোর্য়াটারে সুইডেন থেকে পি এইচ ডি করা এক ভদ্রলোক আসেন। তার স্ত্রী ছিলেন সুইডিশ, ভদ্রলোকের নাম সিদ্দিক আহমেদ। দেশের স্বাধীনতার ব্যাপারে প্রচন্ড উতসাহী এই ভদ্রলোকের সাথে কিছুদিনের মধ্যেই আব্বা' (ডঃ এন, এম শেখ) র খুব বন্ধুত্ব হয়ে গেল, যদিও সিদ্দিক চাচা আব্বার অনেক জুনিয়র ছিলেন, বয়সে এবং র্কমক্ষেত্রে। প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় সিদ্দিক চাচা আমাদের বাসায় আসতেন গরম গরম খবর নিয়ে।

এই সময়ে সায়েন্স ল্যাবরেটরীর পরিচালক ছিলেন, ডঃ কিয়ামউদ্দীন আহমেদ সাহেব। তিনিও এই আন্দোলনের ব্যাপারে ছিলেন প্রচন্ড উতসাহী এবং প্রতক্ষ সর্মথক। ৫২'র একুশে ফেব্রুয়ারীর অনেক বছর আগেই তিনি বাংলা ভাষায় প্রথম বিজ্ঞান বই রচনা করেছিলেন,যার নাম ছিল, 'সাধারন বিজ্ঞান'। এই বইটী ভারত ভাগের আগে এবং পরের বেশ কয়েক বছর স্কুলের পাঠ্যপুস্তক হিসাবে তদানীন্তন পূর্ব্বপাকিস্তান ও পশ্চিম বঙ্গে প্রচলিত ছিল।

দেখতে দেখতে ৭১ চলে আসল। অসহযোগ আন্দোলনের সময় দেখেছি, আব্বা, সিদ্দিক চাচা এবং কিয়ামউদ্দীন চাচা'কে ৭ই মার্চের মিটিং'এ যেতে, সায়েন্স ল্যাবরেটরীর বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলী'দের নিয়ে মিছিল সংগঠিত করতে।

১৯৭১ সালে'র ১৪ ডিসেম্বর আল-বদর'রা সিদ্দিক চাচা'কে বাসা থেকে ধরে নিয়ে যায় এবং উনাকে আর কোন দিন খুঁজে পাওয়া যায় নাই। ডঃ কিয়ামউদ্দীন আহমেদ সাহেব'কে পাকিস্তানীরা ১৯৭১ সালের মাঝামাঝি গ্রেফতার করে এবং উনি ১৭ ডিসেম্বর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মুক্তি পান। আব্বা ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ঢাকা ছেড়ে যাওয়ার ফলে প্রানে বেঁচে যান। এই তিন জনের মধ্যে পরর্বতীতে জীবিত দুইজনের কেউই নিজেদের মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে কোন দিন দাবি করেন নাই বা ফায়দা লুটার চেষ্টা করেন নাই।

‘কারা মুক্তিযোদ্ধা’ এই প্রসংগে প্রায়ই অনেক’কে বলতে শুনি একাত্তুরে রাজাকার ব্যাতীত সকলেই মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। কথাটা একেবারেই ঠিক নয়, কারন মুক্তিযুদ্ধের সর্মথক আর মুক্তিযোদ্ধা এক জিনিশ নয়। মুক্তিযোদ্ধা’রা জেনে শুনে সবকিছু ত্যাগ করে বিদেশে গিয়ে ট্রেনিং নিয়েছেন। মাসের পর মাস, রোদ বৃষ্টিতে ভিজে পুড়ে না খেয়ে যুদ্ধ করেছেন। প্রথমে শুধু মাত্র দুইটা গ্রেনেড হাতে দেশে ফিরেছেন, প্রশিক্ষিত শত্রুর মুখোমুখি হয়েছেন। অনেক মুক্তিযোদ্ধাই জেনে শুনেই প্রান দিয়েছেন। তাদের এই ত্যাগের সাথে অন্য কারো তুলনা করাও অন্যায়। মুক্তিযুদ্ধ করা, আর মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দেওয়া আর ডাব পেড়ে খাওয়ানো এক জিনিশ নয়।

জাতীয় অধ্যাপক প্রয়াত আবদুর রাজ্জাক ‘কারা শহীদ’ এই কথা প্রসংগে একবার বলেছিলেন, “শহীদ হওয়ার জন্য মরা, আর ঘটনা চক্রে মরে শহীদ হওয়া এক জিনিশ নয়”।

একই ভাবে দেখতে পাই, ৫২ সালে ইউনিভার্সিটির ছাত্র ছিলেন এই সুবাদে অনেক যখন নিজেদের ‘ভাষা সৈনিক’ হিসাবে দাবি করেন যা দেখলে সত্যিই তাদের জন্য করুনা হয়। তাদের জন্য রইল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের উক্তি, “চালাকি করে কোন দিন মহৎ হওয়া যায় না”।

দেখতে দেখতে আমরা অটোয়া চলে এসেছি। এখন পরিচিত হব আরো দুইজন বীর মুক্তিযোদ্ধার সাথে।

সম্প্রতি জহির ভাই এক অনন্য উদ্যোগ নিয়েছেন। বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ কর্নেল হায়দার, বীর উত্তম এর উপর বই লিখছেন। অনন্য বলছি এই কারনে, কারন এই প্রথম একজন মুক্তিযোদ্ধা , অন্য আরেক মুক্তিযোদ্ধার জীবন ও র্কমকান্ডের উপর বই লিখছেন। জহির ভাই এই জন্য অনেক সময় ও র্অথ ব্যয় করে কিশোরগণজে কর্নেল হায়দার’এর বাড়ি গিয়েছেন তথ্য সংগ্রহের জন্য। খুজে বের করেছেন কর্নেল হায়দার এর ছোট বোন, সিতারা বেগম, বীর প্রতীক’কে (র্বতমানে, সিতারা রহমান)। আমি জহির ভাই এর এই মহতী উদ্যোগ’এর সাফল্য কামনা করছি আর ডঃ সিদ্দিক আহমেদ সহ সব শহীদদের পবিত্র স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি বিজয়ের এই মাসে।

নাজমুল আহসান শেখ, ঘটনা কানাডা, নভেম্বর; ২০১১, রচনা ৩ ডিসেম্বর ২০১১
victory1971@gmail.com